মানুষ যেভাবে মানুষের ‘রব’ হয়ে যায় (!)

যে শিরোনাম দিয়ে আমি লেখাটি শুরু করেছি, তা শুনে হয়তো আপনি আশ্চর্য হচ্ছেন। আসলেই তো! মানুষ আবার মানুষের ‘রব’ হয় কি করে? আমরা তো জানি ‘রব’ একমাত্র আল্লাহ তা’আয়ালা। অথচ তিনি নিজেই বলেছেন ঃ

“তারা তাদের সণ্যাসী ও ধর্মযাজক (পীর, নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে) আল্লাহর পরিবর্তে ‘রব’ বানিয়ে নিয়েছে-----।” (সূরা তওবা ৯: ৩১)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা’আয়ালা তাঁর নবীকে দাওয়াতী পদ্ধতি শিক্ষা দিতে গিয়েও বলেছেন ঃ

“বলো (হে নবী), ‘হে আহলে কিতাবরা! এসো এমন একটি কথার ওপর আমরা একমত হই, যে ব্যাপারে তোমাদের ও আমাদের মাঝে কোন বিরোধ নেই। তা হলো আমরা আল্লাহ তা’আলা ছাড়া অন্য কারো গোলামী করবো না, তার সাথে কাউকে শরীক করবো না এবং আমরা একে অপরকে আল্লাহর পরিবর্তে ‘রব’ বানিয়ে নেবো না।”(সূরা আলি-’ইমরান ৩: ৬৪)

সরাসরি কোরআনের আয়াত থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, মানুষ মানুষকে ‘রব’ বানিয়ে নেয়। যদিও কারো পক্ষে ‘রব’ হওয়া সম্ভব নয়, তাই এখানে বুঝতে হবে যে অজ্ঞতা, জ্ঞানের স্বল্পতা, একগুয়েমী কিংবা বিভিন্ন কারণে অনেক সময় মানুষ কোনো কোনো মানুষকে এমন স্থানে বসিয়ে দেয়, এমন ক্ষমতা মানুষের হাতে তুলে দেয়; যার কারণে একান্তভাবে আল্লাহর জন্য সংরক্ষিত ক্ষমতার আসনে মানুষকে বসিয়ে ‘রব’ বানিয়ে ফেলে। আর এভাবে নিজেদের কর্মকান্ডের দ্বারা তারা নিজেদের জন্য চিরকালীন জাহান্নাম কিনে নেয়। অথচ এই লোকগুলোর ভেতরে হয়তো এমন মানুষও আছে যারা নামায পড়ে, রোযা রাখে, হজ্জ করে, যাকাত দেয়, দাড়ি আছে, একান্ত নিষ্ঠার সাথে তাসবীহ জপে, এমনকি তাহাজ্জুদ, এশরাক, আওয়াবীন নামাযও পড়ে। তাই মানুষ কিভাবে মানুষের ‘রব’ হয়ে যায়, অর্থাৎ কোন বৈশিষ্ট, গুণাবলী ও ক্ষমতা হাতে তুলে দিলে মানুষকেই রবের আসনে বসিয়ে দেয়া হয়, এ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকার কারণে এই জঘন্যতম অপরাধ যদি আমরা কেউ করে বসি, তাহলে যত নেক আমলই করি না কেন তা কোনো কাজে আসবে না এবং কোনো ইবাদতই কবুল হবে না। এ ব্যাপারে কেয়ামতের দিন কোনো ওজর ওজুহাত চলবে না, জানতাম না বলেও পার পাওয়া যাবে না। কেননা, আল্লাহ তা’আলা স্পষ্ট করে কোরআনে বলে দিয়েছেনঃ

“(হে মানবজাতি) স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন তোমাদের ‘রব’ আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের পরবর্তী বংশধরদের বের করে এনেছেন এবং তাদেরকেই তাদের নিজেদের ব্যাপারে সাক্ষ্য রেখে বলেছেন, ‘আমি কি তোমাদের একমাত্র ‘রব’ নই? তারা সবাই বললো, ‘হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিলাম (যে আপনিই আমাদের একমাত্র ‘রব’)’, এই সাক্ষ্য আমি এ জন্যই নিলাম যে, হয়তো কেয়ামতের দিন তোমরা বলে বসবে যে, আমরা আসলে বিষয়টি জানতামই না।

অথবা তোমরা হয়তো বলে বসবে যে, আমরা তো দেখেছি আমাদের বাপ-দাদারা আগে থেকেই এই শেরকী কর্মকান্ড করে আসছে (সুতরাং আমরা তো অপরাধী না, কারণ) আমরা তো তাদের পরবর্তী বংশধর মাত্র। তারপরও কি তুমি পূর্ববর্তী বাতিলপন্থীদের কর্মকান্ডের কারণে আমাদেরকে ধ্বংস করে দেবে?” (সূরা আরাফ ৭:১৭২-১৭৩)

আল্লাহ (সুব) কোরআনের মাধ্যমে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, এ ব্যাপারে কোনো অজুহাত চলবে না, জানতাম না বলেও কোন লাভ হবে না। তাই আসুন আমরা কোরআনের উপস্থাপিত বাস্তব ঘটনার আলোকে বুঝতে চেষ্টা করি কিভাবে মানুষ মানুষের ‘রব’ হয়ে যায়। কেননা কোরআনের আলোকে বুঝতে চেষ্টা করলে আমাদের জন্য বিষয়টি নির্ভুলভাবে বোঝা অনেক সহজ হয়ে যাবে। মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে একটি বিষয় জেনে নিন, কোরআনে যখন কোন ব্যক্তি বা জাতির ইতিহাস তুলে ধরা হয় তখন বুঝতে হবে ইতিহাস বা গল্প শোনানোই এখানে উদ্দেশ্য নয়, বরং ব্যক্তি কিংবা জাতি কী কাজ করেছিলো এবং এর ফলে তাদের কী পরিণতি হয়েছে তা পর্যালোচনার মাধ্যমে ঐ কাজের পুনরাবৃত্তি থেকে উম্মতে মুহাম্মদীকে সতর্ক করাই ইতিহাস তুলে ধরার উদ্দেশ্য।আর একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, কোরআনে যখনই কোন চরিত্রের উল্লেখ হবে, বুঝতে হবে এ ধরনের চরিত্র কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে থাকবে।

কোরআনের আলোকে মানুষ কিভাবে মানুষের ‘রব’ হয়ে যায় তা খতিয়ে দেখতে গিয়ে মানব জাতির অতীত ইতিহাসেই শুধু নয় বর্তমান বিশ্বেও অসংখ্য (মিথ্যা) রবের পদচারণা আমরা সচরাচর দেখতে পাই। তবে তারা শুধু মুখ দিয়ে বলে না যে, আমরা তোমাদের ‘রব’।

‘রব’ দাবী করা বলতে মূলতঃ কী দাবী করা হয় তা যদি আমরা সত্যিই বুঝতে চাই তাহলে কিছুক্ষণের জন্যে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে ফেরাউনের ইতিহাসের দিকে। কারণ সে যে প্রকাশ্য নিজেকে ‘রব’ ঘোষণা করেছিলো তা কোরআন সুস্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরেছেঃ

“দেশবাসীকে জড় করে সে ভাষণ দিলো, অতপর সে বললো, আমিই তোমাদের সবচেয়ে বড় ‘রব’।” (সূরা নাযিয়াত ৭৯: ২৩-২৪)

এখন কথা হলো, ফেরাউন নিজেকে ‘রব’ বলতে কী বুঝিয়েছে? সে কি দাবী করেছিলো যে, সে আসমান যমীন সৃষ্টি করেছে, মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছে কিংবা পাহাড়-পর্বত যমীনের বুকে গেড়ে যমীনকে সে স্থিতিশীল করে রেখেছে?

না, এমন দাবী সে কখনো করেনি। সে যদি এমন দাবী করতো তাহলে তার সংগী-সাথীরাই তাকে পাগল বলে উড়িয়ে দিতো। বরং সে নিজেও বিভিন্ন পূজা-পার্বনে অংশ নিতো। তারও অনেক ধরনের ইলাহ, মাবুদ বা উপাস্য ছিলো। কোরআন থেকেই এর প্রমাণ দেখে নিনঃ

"ফেরাউনের জাতির নেতারা (ফেরাউনকে) বললো, আপনি কি মূসা ও তার দলবলকে রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টির সুযোগ দিবেন আর তারা আপনাকে ও আপনার ইলাহদের এভাবে বর্জন করে চলবে?" (সূরা আরাফ ৭: ১২৭)

দেখুন আয়াত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে যে, তারও অনেক ইলাহ বা উপাস্য ছিলো। তাহলে তার 'রব' দাবী বলতে আসলে কী বুঝায়? রব বলে সে কী দাবী করেছিলো? আসমান-যমীন, গ্রহ-নক্ষত্র, মানব জাতিসহ কোনো সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা বলে কেউ কোনো দিন দাবী তোলেনি। মক্কার কাফের মোশরেকরাও এসবের সৃষ্টিকর্তা যে আল্লাহ তা'আলা এটা সর্বান্তঃকরণে মানতো। যেমনঃ

"জিজ্ঞাসা কর, 'এই পৃথিবী এবং এর মধ্যে যারা আছে তারা কার, যদি তোমরা জান?' তারা বলবে 'আল্লাহর'। বল, 'তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?' জিজ্ঞাসা কর, 'কে সপ্ত আকাশ এবং মহা আরশের অধিপতি?' তারা বলবে 'আল্লাহ'। বল, 'তবুও কি তোমরা ভয় করবে না?' জিজ্ঞাসা কর, 'সকল কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে, যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যার উপরে আশ্রয়দাতা নেই, যদি তোমরা জান?' তারা বলবে 'আল্লাহর'। বল, 'তবুও তোমরা কেমন করে মোহগ্রস্থ হয়ে আছ?'" (সূরা মু'মিনুন ২৩ঃ ৮৪-৮৯)

এমন আরো অসংখ্য আয়াত আছে যা প্রমাণ করে যে, তারা সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, লালনকর্তা, পালনকর্তা ও রিযিকদাতা হিসাবে আল্লাহকে মানতো, সুতরাং সমস্যাটা কোথায় ? এই বিশ্বাস থাকার পরও কেন তারা কাফের-মোশরেক, কেন তাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত ? ফেরাউন তাহলে কী দাবী করেছিলো ? এই প্রশ্নগুলো শুনে হয়তো অনেকে বিভ্রান্তিতে পড়ে যাবেন। কিন্তু বিভ্রান্ত হওয়ার কিংবা অন্ধকারে হাতড়ে মরার কোনো প্রয়োজনই নেই। সরাসরি আল্লাহর কালাম কোরআনই আমাদেরকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছে যে, ফেরাউনের দাবী ছিল সার্বভৌমত্বের দাবী। সারা পৃথিবীতে নয় তার দাবী ছিল কেবল মিশরের শাসন ক্ষমতার উপর নিরংকুশ আধিপত্যের দাবী। তার দাবী ছিলো মিশরের সাধারণ জনগণের জন্যে তার ইচ্ছানুযায়ী যেমন খুশী তেমন আইন-কানুন ও মূল্যবোধ নির্ধারনের ক্ষমতার দাবী। দেখুন কোরআন কী বলেছেঃ

"ফেরাউন তার জাতির উদ্দেশ্যে (এক) ভাষণ দিলো। সে বললো, মিশরের সার্বভৌমত্ব কি আমার নয়? তোমরা কি দেখছো না যে, এই নদীগুলো আমার (রাজত্বের) অধীনেই বয়ে চলছে--------।" (সূরা যুখরুফ ৪৩:৫১)

"এসব বলে সে তার জাতিকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুললো, এক পর্যায়ে তারা তার আনুগত্য মেনেও নিলো। এটি প্রমাণ করে যে, নিঃসন্দেহে তারা নিজেরাও ছিলো এক পাপীষ্ঠ জাতি।" (সূরা যুখরুফ ৪৩:৫৪)

কোরআনের আয়াতগুলো এবং বাস্তব প্রেক্ষাপট যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, চক্র বা যে কারো সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়া মানেই হলো তাকে বা তাদেরকে 'রব' বানিয়ে নেয়া। কারণ অন্য কারো সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়া মানেই হলো আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে আইন-কানুন রচনা করার অধিকারসহ নিরংকুশ শাসন কর্তৃত্ব তাদের হাতে তুলে দেয়া।

তারা কিভাবে তাদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে 'রব' বানিয়ে নিয়েছিলো তা আমরা সরাসরি আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর করা এই আয়াতের তাফসীরের আলোকে একেবারে স্পষ্ট করে বুঝতে পারবো ইনশাআল্লাহ। তিরমিযীতে উদ্ধৃত হাদিসে হযরত আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে এসে দেখলাম তিনি সূরা তওবার এই আয়াতটি তেলাওয়াত করছিলেনঃ

"তারা তাদের সন্ন্যাসী ও ধর্মযাজক (পীর, নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে) আল্লাহর পরিবর্তে 'রব' বানিয়ে নিয়েছে------।" (সূরা তওবা ৯:৩১)

অতপর রাসূল (সাঃ) বলেন তোমরা শোনো তারা তাদেরকে (শাব্দিক অর্থে) পূজা/ উপাসনা করতো না, কিন্তু তারা যখন মনগড়া ভাবে কোনো কিছুকে বৈধ ঘোষনা করতো, জনগণ তা মেনে নিতো, আর যখন কোনো কিছুকে অবৈধ ঘোষণা করতো তখন তারা তা অবৈধ বলে মেনে নিতো।

তাফসীরে ইবনে কাসীরে ইমাম আহমদ তিরমিযী ও ইবনে জারীরের সূত্রে আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তার কাছে ইসলামের দাওয়াত আসার পরে প্রথমে তিনি সিরিয়ায় পালিয়ে গিয়েছিলেন, পরে যখন রাসূল (সাঃ) এর কাছে তিনি এলেন তখন তার গলায় ক্রুশ ঝুলানো ছিলো। তখন রাসূল (সাঃ) উল্লেখিত আয়াতটি পড়ছিলেন। হযরত আদী (রাঃ) বলেন, আহলে কিতাবরা (ইহুদী ও খৃষ্টানরা) তো আলেম/ দরবেশদের (তথা নেতাদের) পূজা উপাসনা করতো না ! রাসূল (সাঃ) বললেন, তা সত্য। তবে তারা মনমতো কোনো কিছুকে বৈধ কিংবা অবৈধ ঘোষনা করলে জনগণ তা নির্বিচারে মেনে নিতো। এটাই তাদের পূজা-উপাসনা/ ইবাদত।

বর্তমান তাগুতী (সীমালঙ্ঘনকারী) সরকার ব্যবস্থায় এর উদাহরণ দেখুন, ১. মদ, ২. জুয়া, ৩. লটারী, ৪. সুদ, ৫. বেপর্দা, ৬.নারী নেতৃত্ব, ৭. বেশ্যাবৃত্তি (ব্যভিচার) ৮. এমন আরো অসংখ্য বিষয় রয়েছে, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা কঠোর ভাবে অবৈধ ঘোষণা করেছেন, পক্ষান্তরে, তারা এগুলোকে বৈধতার সার্টিফিকেট দিয়েছে। দন্ডবিধির বিষয়টি দেখুন, চুরি ও ডাকাতির দন্ড, ব্যভিচারের দন্ড, সন্ত্রাস দমন আইন, বিবাহ বিধিসহ আরো অনেক বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা যে বিধান আল-কোরআনের মাধ্যমে ঘোষনা করেছেন, তা বাদ দিয়ে তারা নিজেদের মনমতো দন্ড বিধি বৈধ করছে। এই অধিকার তারা পেলো কোথা থেকে। কে দিলো তাদেরকে এই অধিকার। যারা এদেরকে সমর্থন, রক্ষনাবেক্ষণ, সম্মান এবং প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমরণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তাদের উদ্দেশ্যে আমার বক্তব্য হচ্ছে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ! ঐ দিন (বিচার দিবস) আসার পূর্বেই নিজেদের আমলকে শুধরে নাও, যেদিন কেউ কারো সাহায্য করবে না এবং প্রত্যেককে তার নিজের কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে এবং তওবা করে আল্লাহর মনোনীত জীবন ব্যবস্থায় (ইসলামে) ফিরে এসো। কেননা আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে ঈমান আনার পূর্বে শর্ত দিয়েছেন এসব তাগুতী সরকারদের সাথে কুফরী/ অস্বীকার করার এবং এসব শয়তানী মতাদর্শকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে একমাত্র ইসলামকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।

কোরআনের আয়াতের আলোকে তাওহীদ এবং শিরকের সংজ্ঞা নির্ধারণে ইসলামের আইন কানুন ও আক্বীদা বিশ্বাস একই গুরুত্ব বহন করে। আক্বীদা বিশ্বাস থেকেই এর আইন কানুন উৎসারিত। আরো সতর্কভাবে বলতে গেলে, এর আইন কানুন অবিকল এর আক্বীদা বিশ্বাস। আইন কানুন আক্বীদা বিশ্বাসেরই বাস্তব রূপ। এই মৌলিক সত্যটি কোরআনের আয়াতসমূহ থেকে এবং কোরআনের বর্ণনাভংগি থেকে সূর্যের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অথচ শত শত বছর ধরে মুসলমানদের মনে বিরাজমান ধর্ম সংক্রান্ত বিশ্বাস থেকে এই সত্যটিকে অত্যান্ত সুক্ষ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। এমনকি পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত এতোদূর গড়িয়েছে যে, ইসলামের শত্রুরা তো দূরের কথা, এর উৎসাহী ভক্তরা পর্যন্ত শাসন ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বকে ইসলামী আক্বীদা বিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন একটা ব্যাপার বলে মনে করতে আরম্ভ করেছে। ইসলামের খুঁটিনাটি আমলের জন্য তারা যেমন উতালা ও আবেগোদীপ্ত হয়, রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের জন্যে কিছুতেই তেমন হয় না। ইসলামের ছোটখাটো আমল আখলাক থেকে বিচ্যুতিকে যেমন তারা বিচ্যুতি গণ্য করে, ইসলামের রাজনৈতিক, সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় বিধান থেকে বিচ্যুতিকে সে ধরনের বিচ্যুতি গন্য করে না। অথচ ইসলাম এমন একটা জীবন বিধান, যার আক্বীদা, আমল আখলাক, চরিত্র ও আইন কানুনে কোন বিভাজন নেই। কিছু কুচক্রী মহল সুপরিকল্পিত পন্থায় শত শত বছর ধরে এর মধ্যে বিভাজন ঢুকানোর চেষ্টা করেছে। এরই ফলে ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতা তথা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব সংক্রান্ত এমন মৌলিক বিষয়টি এতো তুচ্ছ ও ঐচ্ছিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। শুধু সাধারণ মানুষ নয়, এমনকি ইসলামের সবচেয়ে আবেগাপুত ভক্তরাও আজকাল একে কম গুরুত্বপূর্ণ ও ঐচ্ছিক বিষয় ভাবতে শুরু করেছে।

যারা মূর্তিপূজা করাকে শেরেক বলে অভিহিত করে, অথচ আল্লাহদ্রোহী শক্তির শাসন মান্য করাকে শেরেক বলে আখ্যায়িত করে না এবং মূর্তি পূজারীকে মোশরেক মনে করে, কিন্তু তাগুতী শক্তি তথা মানবরচিত আইনের অনুসারীদের মোশরেক মনে করে না, তারা আসলে কোরআন অধ্যায়ন করে না এবং ইসলামকে চেনে না। রাসূল (সাঃ)-এর ঘটনাবহুল রাজনৈতিক জীবনকে পর্যবেক্ষণ করে না। তাদের উচিত যেভাবে আল্লাহ তা'আলা কোরআন নাযিল করেছেন, সেই ভাবেই তা পড়া।

আরো দুঃখজনক ব্যাপার হলো, ইসলামের এই দরদী ভক্তদের কেউ কেউ প্রচলিত তাগুতী রাষ্ট্র ব্যবস্থার কিছু কিছু আইন, পদক্ষেপ ও কথাবার্তা সম্পর্কে মাঝে মধ্যে খুঁত ধরেন যে, অমুক কাজ ইসলাম বিরোধী। কোথাও কোথাও কিছু ইসলাম বিরোধী আইন বা বিধি ব্যবস্থা দেখে তারা রেগে যান। তাদের ভাব দেখে মনে হয়, যেন ইসলাম তো পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়েই আছে, তাই অমুক অমুক ত্রুটি যেন তার পূর্নতার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে আছে।

এই সকল দ্বীনদরদী (!) ব্যক্তি তাদের অজান্তেই ইসলামের ক্ষতি সাধন করে থাকেন। তাদের সেই মূল্যবান শক্তিকে তারা এসব অহেতুক কাজে অপচয় করেন, অথচ তা ইসলামের মৌলিক আক্বীদা বিশ্বাস প্রতিষ্ঠায় ব্যয় করা যেতো। এসব কাজ দ্বারা তারা আসলে জাহেলী সমাজ রাষ্ট্রের পক্ষেই সাফাই গান। কেননা, এর দ্বারা বোঝা যায় যে, ইসলাম তো এখানে কায়েম আছেই, কেবল অমুক অমুক ত্রুটি শুধরালেই তা পূর্ণতা লাভ করবে। অথচ এখানে সার্বভৌম ক্ষমতা অর্থাৎ আইন প্রনয়ন, শাসন ও বিচার ফয়সালার সর্বময় চূড়ান্ত ক্ষমতা ও এখতিয়ার যতক্ষণ মানুষের হাত থেকে পরিপূর্ণভাবে ছিনিয়ে এনে আল্লাহর হাতে ন্যস্ত না হবে, ততক্ষণ ইসলামের অস্তিত্ব বলতেই এখানে কিছু নেই। কারণ অন্যের সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়া অর্থই হলো আল্লাহকে অস্বীকার করা। আর যেখানে আল্লাহকে অস্বীকার করা হয় সেখানে ইসলামের অস্তিত কিভাবে থাকে। এটি কাফের মোশরেকদের এমন এক সূক্ষ-ষড়যন্ত্র, যার মাধ্যমে আল্লাহকে কার্যত অস্বীকার করা সত্তেও সাধারণ মানুষ তা বুঝতে পারে না। আপনি লক্ষ্য করলে দেখতে পারেন, তারা বলে না তোমরা ইসলাম ছাড়ো, তারা বলে, গণতন্ত্র (জনগনের আইন) গ্রহণ কর, কেননা তারা ভালো করেই জানে, গণতন্ত্র গ্রহণ অর্থই হলো ইসলামকে বর্জন করা।

মনে রাখতে হবে যে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বহাল থাকলেই অর্থাৎ আল্লাহকে একমাত্র নিরংকুশ আইনদাতা মানলেই ইসলামের অস্তিত্ব অক্ষুন্ন থাকে।আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বজায় না থাকলে সেখানে ইসলামের অস্তিত এক মুহূর্তও থাকতে পারে না। বলার অপেক্ষা

রাখেনা যে, আজকের পৃথিবীতে ইসলামের একমাত্র সমস্যা এই যে, আল্লাহর যমীনে আল্লাহদ্রোহী তাগুতী শক্তি রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও প্রভুত্বের ওপর ভাগ বসাচ্ছে, তা ছিনতাই করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে আর নামাযী, দাড়ী-টুপিওয়ালা, তাসবীহ ওয়ালা লোকরা তাদেরকে সমর্থন দেয়া থেকে শুরু করে সরকারের অধীনে বিভিন্ন পদ গ্রহণ করে তাদের সহায়তা করে বৈষয়িক ফায়দা লুটছে।

এই শাসক শ্রেনী তাদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা নিশ্চিত করছে এবং স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, অর্থনীতি, সমাজ, পরিবার তথা সাধারণ মানুষের জীবন, সহায় সম্পদ ও তাদের মধ্যে বিবাদমান বিষয়ে নিজেদের খেয়ালখুশী মতো বিধি নিষেধ প্রয়োগ করছে। এটাই সেই সমস্যা যার মোকাবেলা করার জন্য কোরআন নাযিল হয়েছে এবং সে আইন প্রনোয়ণ ও বিধি নিষেধ প্রনোয়ণ ও প্রয়োগের ক্ষমতাকে দাসত্ব ও প্রভুত্বের সাথে সম্পৃক্ত করেছে এবং স্পষ্ট ভাষায় ঘোষনা করেছে যে, এর আলোকেই সিদ্ধান্ত আসবে কে মুসলিম-কে অমুসলিম, কে মু'মিন ও কে কাফির।

ইসলাম তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রথম যে লড়াই চালিয়েছে, তা নাস্তিকতার বিরুদ্ধে পরিচালিত লড়াই ছিলনা। এ লড়াই সামাজিক ও নৈতিক উচ্ছৃংখলতার বিরুদ্ধেও ছিল না। কেননা এসব হচ্ছে ইসলামের অস্তিত্বের লড়াইয়ের পরবর্তী লড়াই। বস্তুতঃ ইসলাম নিজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বপ্রথম যে লড়াই করেছে, তা ছিল সার্বভৌমত্বের অধিকারী কে হবে সেটা স্থীর করার লড়াই। এজন্য ইসলাম মক্কায় থাকা অবস্থাতে এ লড়াইয়ের সূচনা করেছিল। সেখানে সে কেবল আক্বিদা বিশ্বাসের পর্যায়ে এ কাজ করেছিল, রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠা বা আইন প্রণয়নের চেষ্টা করেনি। তখন কেবল মানুষের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধ মূল করার চেষ্টা করেছে যে, সার্বভৌমত্ব তথা প্রভুত্ব ও সর্বময় ক্ষমতা এবং আইন বা হুকুম জারির ক্ষমতা ও শর্তহীন আনুগত্য লাভের অধিকার একমাত্র আল্লাহর। কোন মুসলমান এই সার্বভৌমত্বের দাবী করতে পারে না এবং অন্য কেউ দাবী করলে জীবন গেলেও সেই দাবী মেনে নেবে না। মক্কায় অবস্থান কালে মুসলমানদের মনে যখন এই আক্বিদা দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হলো, তখন আল্লাহ তা'আয়ালা তাদেরকে তা বাস্তবে প্রয়োগের সুযোগ দিলেন মদিনায়।

সুতরাং আজকালকার ইসলামের একনিষ্ঠ ও আবেগোদ্দীপ্ত ভক্তরা ভেবে দেখুন, তারা ইসলামের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করেছেন কি না?

যারা একমাত্র আল্লাহর গোলামী করে এবং মানুষকে 'রব'-এর আসনে বসায় না তারাই মুসলমান। এই বৈশিষ্ট্যই তাদেরকে দুনিয়ার সকল জাতি ও গোষ্ঠির উর্ধে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করে এবং দুনিয়ার সকল জাতির জীবন যাপন পদ্ধতির মধ্য থেকে তাদের জীবন পদ্ধতির স্বকীয়তার নির্দেশ করে। উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে থাকলে তারা মুসলমান, নচেত তারা অমুসলিম, চাই তারা যতই নিজেদের মুসলমান বলে দাবী করুক না কেন।

মানবরচিত সকল জীবন ব্যবস্থায় মানুষ মানুষকেই আল্লাহর আসনে বসায়। কোন দেশে সর্বোচ্চমানের গণতন্ত্র কিংবা সর্বনিম্নমানের স্বৈরাতন্ত্র- যা-ই থাকুক সর্বত্র এই একই অবস্থা। প্রভূত্বের সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট্য হলো মানুষকে গোলাম বানানোর অধিকার এবং মানুষের জন্য আইন-কানুন, মূলবোধ ও মানদন্ড রচনার অধিকার। পরিমার্জিত পরিশোধ বা অঘোষিতভাবে হোক, মানবরচিত সকল ব্যবস্থায় একটি মানবগোষ্ঠী কোন না কোন আকারে এই অধিকারের দাবীদার। এতে করে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর লোকেরা অবৈধভাবে সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন হয়ে পড়ে। এই নির্দিষ্ট গোষ্ঠীটি বাদ বাকী দেশবাসীর দন্ডমূন্ডের কর্তা হয়ে তাদের জন্য আইন কানুন,রীতি নীতি, মূল্যবোধ ও মানদন্ড নির্ধারণ করে। কোরআনের আয়াতে একেই বলা হয়েছে মানুষকে মানুষের 'রব' বানিয়ে নেয়া। এভাবেই বর্তমান বিশ্বের সকল দেশের সাধারণ জনগণ তাদের শাসক শ্রেণীর ইবাদত/অনুগত্য/গোলামী করে, যদিও তারা তাদের উদ্দেশ্যে রুকু-সিজদা করেনা।

এই অর্থেই ইসলাম আল্লাহর দেয়া একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। দুনিয়ার সকল নবী ও রাসূল এই ইসলাম নিয়েই এসেছিলেন। আল্লাহ তা'আয়ালা মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে তার নিজের দাসত্বের অধীন করার জন্য এবং মানুষকে যুলুম থেকে মুক্ত করে আল্লাহর ন্যায়-বিচারের ছায়াতলে আশ্রয় দানের জন্যই নবীদেরকে যুগে যুগে ইসলামী বিধান সহকারে পাঠিয়েছেন। যারা তা অগ্রাহ্য করে, তারা মুসলমান নয়, তা সে যতই সাফাই গেয়ে নিজেকে মুসলমান প্রমাণ করার চেষ্টা করুক না কেন এবং তাদের নাম আব্দুর রহমান, আব্দুর রহিম যাই হোক না কেন।

আল্লাহ আমাদের হক্ককে হক্ক হিসেবে চেনার ও তা পালন করার তৌফিক দান করুন এবং বাতিলকে বাতিল হিসেবে চেনার ও তা থেকে দূরে থাকার তৌফিক দান করুন। হে আল্লাহ! সমস্ত তাগুতী শক্তিকে ধ্বংস করুন। .... আমিন।